বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার,জানুয়ারি ২৮, ২০১৬, মাঘ ১৫, ১৪২২

কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করলে শহরে মানুষের আগমন কমবে

ড. সেলিম রশিদ | ২০১৬-০১-২৮ ইং

ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস থেকে স্নাতক এবং ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশনের সভাপতি। তার কাজের বিষয় উন্নয়ন অর্থনীতি, অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রভৃতি। প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে দি ইকোনমিক জার্নাল অব ইকোনমিক থিওরি, ইকোনমেট্রিকা, জার্নাল অব ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিকস, ইকোনম্যানিয়াসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো— ইকোনমিকস উইথ ম্যানি এজেন্টস, দ্য মিথ অব অ্যাডাম স্মিথ, ইকোনমিক পলিসি ফর গ্রোথ। বর্তমানে অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়কে কেন্দ্র করে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ নিয়ে কাজ করছেন। বিষয়টি নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাত্কার নিয়েছেন এম এম মুসা

কম্প্যাক্ট টাউনশিপ উদ্যোগের ধারণা কীভাবে প্রথম আসে?

আমি সবসময় ইতিহাস পড়ি। ইংল্যান্ডের ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রায় প্রতিটি বড় কারখানা শ্রমিকদের সুবিধা দিতে আলাদা আলাদা অঞ্চল গড়ে তোলে। এগুলোকে 'ফ্যাক্টরি টাউন' বলে। এ অঞ্চলেই মালিকরা শ্রমিকের সব সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। শ্রমিকের সন্তানদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল, বাসস্থানসহ সবকিছুর ব্যবস্থা করেন। এতে শ্রমিকরাও কারখানাকে নিজের বলে মনে করেন। তারা বুঝতে পারেন কারখানার উন্নয়ন মানে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন। বাংলাদেশের গার্মেন্টস বা অন্যান্য শিল্পমালিকরা একটু ভালোভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, এ কম্প্যাক্ট টাউনশিপ তাদের ব্যবসার জন্য কত বেশি লাভজনক। নতুন গড়ে ওঠা আবাসন ও বাড়িগুলোকে মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে প্রতি বছর শত শত কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করতে হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে কৃষিজমি। অন্যদিকে দেশের মেগাসিটি ও শহরগুলোয় রাস্তায় যানজটের কারণে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। ২ ঘণ্টার রাস্তা যেতে ৪ ঘণ্টা লাগছে। কাজের সন্ধানে মানুষ শহরে আসছে। জনসংখ্যার এ বিশাল চাপ শহর ধারণ করতে পারছে না। বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে শহর। ক্রমেই আমরা অচলায়তনের ভেতরে ঢুকে পড়ছি।

‘কম্প্যাক্ট টাউনশিপ’ বলতে কী বোঝাচ্ছেন?

কম্প্যাক্ট টাউনশিপ— আবাসন, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, মার্কেট, গ্রামীণ শিল্প, স্থানীয় সরকারের ইউনিট ইত্যাদিসহ সব মৌলিক প্রয়োজন ও সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের একটি সমন্বিত রূপ; যা প্রায় ২০ হাজার মানুষকে সমন্বিত সেবা দেবে। এমনকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৭০ হাজার গ্রামের বাংলাদেশে ছয় হাজার কম্প্যাক্ট টাউন তৈরি করা যেতে পারে। এটি প্রকৃত অর্থেই একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। সেখানে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা প্রদান করা গেলে মানুষ আর কৃষিজমি নষ্ট করে ক্রমাগত বাড়ি না তৈরি করে এসব মেগাসিটিতে এসে উঠবে। প্রত্যেকটি সিটি বিশেষ বিশেষ কর্মসংস্থান ও ব্যবসাকেন্দ্রিক হবে। ফলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও বাড়বে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করি। কুমিল্লায় বার্ড আছে। বর্তমানে সেখানে শুধু শিক্ষা আর থাকার ব্যবস্থা আছে। এর সঙ্গে ইন্টারনেট, যাতায়াত, হাসপাতাল ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যুক্ত করা গেলে একে একটা ‘কম্প্যাক্ট টাউন’ বলা হতো। সহজে বললে বলতে হয়, গ্রাম এলাকায় গুচ্ছ ছোট শহরের নাম কম্প্যাক্ট টাউনশিপ। অর্থাত্ মানুষ তাদের জমি ছেড়ে সুযোগ-সুবিধার জন্য এ শহরগুলোয় আসবে। আমেরিকার গণতন্ত্র যে উত্কর্ষ লাভ করেছে, তার পেছনে রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে স্বশাসন ব্যবস্থার প্রচলন। টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশেরও এ লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সিটির ভেতরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে স্বশাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট। অন্যদিকে সিটির অভ্যন্তরীণ নকশার বাইরে থাকবে ট্রাফিক। সেজন্য সিটি থাকবে উত্তম যোগাযোগের আওতায় তথা পরিবেশবান্ধব। কম্প্যাক্ট টাউনশিপ জলাশয়ের পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্বসহ মিঠা পানিতে মত্স্যচাষের নিশ্চয়তা দেবে। টাউনশিপ মানে এই নয় যে, গ্রামের মানুষ একেবারে শহরের আদলে জীবনযাপন করবে। স্থানীয় সামগ্রী দিয়েও বহুতল ভবন নির্মাণ সম্ভব। গ্রামীণ জীবন প্রণালির ক্ষতি না করে গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায় এমন নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বহুতল বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য হলো, অপরিকল্পিত আবাসন নির্মাণ রোধের মাধ্যমে কৃষিজমি রক্ষা করা।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তো জমি ছাড়তে চায় না...

একথা আমাকে আমলারাও বলেছেন। তখন আমি গ্রামে গবেষণা করেছি। সে গবেষণার ভিত্তিতে বলছি, গ্রামের মানুষ এমন প্রকল্প পেলে তা গ্রহণ করবে। একটা উদাহরণ দিই। আমেরিকা কোনো ডিভি ভিসার ঘোষণা দিলে আবেদনপত্রে ডাকঘর বোঝাই হয়ে যায়। মানুষ তার সহায়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে, ধারদেনা করে বাংলাদেশ থেকে ১২ হাজার মাইল দূরে গিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা খোঁজে। কিন্তু ১২ হাজার গজ দূরে আবাসন, শিক্ষা বা চিকিত্সার সন্ধানে যাবে না— এ আপত্তি আমার কাছে ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। একটি এলাকায় সব সুবিধা দিলে গ্রামের মানুষ সেখানেই বসবাস করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি না; কিন্তু একটা জরিপ করে প্রমাণ করুন, গ্রামের লোকদের এসব সুবিধা দিলে তারা ভিটে ছাড়বে না। গবেষণা করে দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ এমন নগর চায়, যেখানে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। কম্প্যাক্ট টাউনশিপে সবাই স্বপ্রণোদিত হয়ে আসবেন; কোনো জোরজবরদস্তি করা হবে না। শুধু পরোক্ষভাবে উত্সাহিত করা যেতে পারে। সরকারের কাছে কোনো সহযোগিতা চাওয়া যাবে না, যদি এটি সাধ্যের বাইরে না যায়। যারা সিটিতে সম্পৃক্ত থাকবেন, তারা সহজেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, ব্যাংকিং, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিষেবা পাবেন। যারা আসবেন না, তারাও সেবা পাবেন। তবে সেটি এত উন্নত হবে না।

সরকারের অধিকাংশ পরিকল্পনা শহরকেন্দ্রিক। গ্রামকেন্দ্রিক পরিকল্পনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। কেন?

গ্রাম ছাড়া শহরকে বাঁচানো যাবে কী করে? আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশে কমপক্ষে পাঁচ থেকে নয় কোটি লোক বাড়বে। এরা কোথায় বাস করবে? গ্রামের মানুষ ন্যূনতম সুবিধার জন্য শহরে এসে বস্তিতে থাকছে। ফলে শহরকে শত উন্নত করা হলেও বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে না এটি। আমেরিকায় গবেষণা করে দেখা গেছে, শহরের রাস্তা বাড়ানো হলেও যানজটের পরিমাণ কমে না। কারণ রাস্তার সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা এবং এটি ব্যবহারের হারও বেড়ে যায়। আংশিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এর পূর্ণ সমাধানের জন্য আগে গ্রামে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে।

সরকারের গ্রাম উন্নয়নে উদাসীনতার কারণ কী?

সব শহরবাসী অভিজাত। তারাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ফলে গ্রামের উন্নয়নের দিকে কারো মনোযোগ নেই।

বেসরকারি উদ্যোগে কি কম্প্যাক্ট টাউনশিপ গড়ে তোলা সম্ভব?

এটাই তো বলছি। তবে সরকারকে বাদ দেয়া যাবে না। গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে বুঝিয়ে এ সমস্যা সমাধান করতে হবে। কোনো উদ্যোক্তা এ প্রকল্পের উদ্যোগ নিলে তিনি নিজ খরচায় সেটি করতে পারেন। সেখানে তেমন কারো অনুমতির দরকার নেই। কিন্তু তেমন না হলে অধিকাংশ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। শহরে বা বিদেশে বসে এর সমাধান সম্ভব নয়। কোন অঞ্চলের মানুষ কোন

ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমে অভ্যস্ত, সে অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার সাহায্য করবে বেসরকারি খাতকে।

যেকোনো স্বল্পোন্নত দেশ নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে কোনটি আমরা আগে সমাধান করব, তা নির্ধারণ করা জরুরি বৈকি। আসল ব্যাপার হলো, অনেক সমস্যার ঝাঁপি থেকে মূল সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য পথটি নির্দেশ করতে হবে।

দেশের চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যত কী হবে বলে মনে করেন?

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসে রেমিট্যান্স থেকে। এতে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এর অন্য মানে দাঁড়ায়— দেশ না ছাড়লে আমি খেতে পারি না। এটা কী ধরনের রাষ্ট্র?

এরা তো বিদেশে নানা ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়ছেন?

হ্যাঁ। এ সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেই। এমনকি বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের নানা কষ্টের কথাও শুনেছি। আমেরিকা, ইউরোপ, ফিজি, মালয়েশিয়াসহ প্রায় সব দেশেই বাংলাদেশী মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। কোরিয়া কিংবা অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তি নয়, বরং শ্রমিক, দারোয়ান, সুইপার পাঠাচ্ছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। কিছুদিন পরেই আবার নতুন বিপদ আসবে।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কী ধরনের সমস্যা দেখছেন?

অনেক বড় সমস্যা রয়েছে। এ প্রকল্প নিয়ে বেশকিছু ডেভেলপার কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের পরামর্শ দিয়েছি, এ ধরনের ছোট শহর তৈরি করে সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করতে অনুরোধ জানিয়েছি। এতে দেশের উন্নয়নের পাশাপাশি বছর দুয়েক পর থেকেই কোম্পানিও মুনাফা পেতে থাকবে।

তারা কি এ প্রস্তাবে রাজি?

বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিক তিন বা পাঁচ বছরের বেশি পরিকল্পনা নিয়ে এগোয় না। আর ব্যবসায়ীরা তো আরো না। তারা দ্রুত মুনাফা পেতে চান। অর্থাত্ এ প্রকল্পে তাদের ইচ্ছা কম। সবাই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করে দ্রুত লাভবান হতে চান। কিন্তু এটা বোঝেন না যে, সবকিছু স্বল্পমেয়াদি হলে সবসময় তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকতে হয়। পরিকল্পনা মানে ভবিষ্যতের সমস্যা সমাধানে বর্তমানেই উদ্যোগ নেয়া। এমন কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

নগরায়ণ নিয়ে বেশকিছু পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

এ পরিকল্পনাগুলোর কোনো মানে নেই। নগরায়ণ নিয়ে আমার কাজ কম। সার্বিকভাবে গোটা দেশের কল্যাণেই আমার মূল চিন্তা। সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ার মূল কারণগুলো নিয়ে বুয়েটে বেশকিছু কাজ হয়েছে। সমস্যার গুরুত্ব অনুযায়ী বুঝতে হবে তার প্রকার ও আকার। আমি শুধু একটা সমাধান দিয়েছি। অন্য কেউ আরো ভালো সমাধান দিলে সাগ্রহে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। রফতানি খাতে সমৃদ্ধি যোগ করার জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে ধান রফতানির কথাও বলেছি। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ ধান রফতানিতে সক্ষম হবে, তাই এ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা এখনই নেয়া উচিত। কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

কীভাবে চাল রফতানি সম্ভব হতে পারে?

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাহিদা অনুযায়ী ধান উত্পাদনে সক্ষম একটি দেশ। কিন্তু আমরা আরো ২০ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত চাল উত্পাদন করতে পারি। যদি অতিরিক্ত এই চাল বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য অনুযায়ী প্রতি কেজি ৬০ টাকায় বিক্রি করি, তাহলে আমাদের কৃষকরা বছরে ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা আয় করতে পারে। তাহলে বাধা কোথায়? দেশের কৃষকরা অতিরিক্ত এই চাল উত্পাদনে আগ্রহী হবেন, যদি বিশ্ববাজার অনুযায়ী তারা এই ন্যায্য দাম পান। যেহেতু এটি অতিরিক্ত চাল, সেহেতু এতে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় কোনো সংকট হবে না। চাহিদা অনুযায়ী চাল মজুদ থাকবে। প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. জেড করিম বলেছেন, বাংলাদেশ বছরে ২৫ মিলিয়ন টন বাড়তি চাল উত্পাদন করতে পারে।

ধান উত্পাদন এবং এর বিপণন-সংশ্লিষ্ট ব্যয় যেহেতু পুরোপুরিই অভ্যন্তরীণ বিষয়, এতে দেশের বেকার যুবকরা নতুন চাকরি পাবে। ধান প্রক্রিয়াকরণ এবং এর পরিবহনেও অনেক কর্মসংস্থান হবে। শুধু ট্রাক ব্যবহারের কথাই চিন্তা করি। ২০ মিলিয়ন টন চাল পরিবহনে ১০ টন ধারণক্ষম কতগুলো ট্রাকের প্রয়োজন হবে? পরিবহনের সুবিধার্থে নৌপথের ব্যবহার অনেক গুণ বাড়বে।

গ্রামীণ ও শহুরে, গরিব ও ধনী— উপার্জনের নিরিখে এ চারটি গ্রুপের মানুষের কথা ভাবা যাক। গ্রামীণ জনগণের সমস্যার কথা বিবেচনায় নিতে হবে। গ্রামীণ ধনীরা আরো ধনী হবে যদি চাল রফতানির অনুমতি পাওয়া যায়। জমির মূল্য বেড়ে যাবে। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের কর আদায় বাড়বে, যা দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য খরচেরও জোগান হবে। গ্রামের মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবসময়ই গ্রামীণ মজুরি বেড়েছে। এর যে বাস্তব প্রভাব পড়বে তা হচ্ছে, বিদ্যমান আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে, মফস্বল শহরগুলোর উন্নয়ন ঘটবে এবং ঢাকামুখী জনস্রোত কমে আসবে।

গ্রামীণ আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেরা শহরে চালের উচ্চমূল্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু গ্রামে জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে অন্যভাবে লাভবান হবে। কারণ জমির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অনেকে বলেন, গ্রামে আমাদের জমি আছে কিন্তু আমরা কখনই সেখান থেকে কোনো টাকা-পয়সা আনি না। আচ্ছা, কেউ যদি খুব ধনী হন তাহলে তো তার টাকা আনার দরকার নেই, ভালো কথা। কিন্তু যদি ওই জমি থেকে আয় ১০ গুণ বেড়ে যায়, তখন হয়তো তিনি এ বিষয়ে সচেতন হবেন। গ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কযুক্ত লোকদের ওপর চাল রফতানির সিদ্ধান্তে কোনো প্রভাব পড়বে না। চাল রফতানির সিদ্ধান্তে তারা হয়তো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যাদের গ্রামের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা দেশের শিক্ষা ও মানবসম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। এরা যেকোনো মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিস্থিতিতে থাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। এদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার ৫ শতাংশ অথবা সংখ্যায় ১ কোটি। এই পাঁচ ভাগ লোকের দাবির মুখে চাল রফতানির সিদ্ধান্ত, যা কিনা ১৫ কোটি লোকের জন্য লাভজনক হবে, তা কি উপেক্ষা করা হবে?

গ্রামোন্নয়ন কীভাবে সম্ভব?

ভালো কোনো শিক্ষক, চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী গ্রামে যেতে চান না এবং সেখানে থাকতেও চান না। কারণ সেখানে শহরের মতো চিকিত্সা, শিক্ষা, ইন্টারনেট, যাতায়াত প্রভৃতি সুবিধা নেই। অথচ এ সুবিধাগুলো দেয়া হলে মানুষ শহরমুখী না হয়ে গ্রামেই আধুনিক জীবনযাপনের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নের চেষ্টা করবে। পরিবেশও অনেকাংশে রক্ষা হবে। শহরগুলোয় মানুষের চাপ কমবে।

কম্প্যাক্ট টাউনশিপের মাধ্যমে কি বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে?

অবশ্যই! কেউ কৃষিতে উদ্যোগী হবে, কেউ ব্যবসায় আসবে। তবে কারখানার উন্নয়নের ফলে সর্বাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের জোগান হবে। আবার এ কারখানা উন্নয়নে দরকার যথার্থ অবকাঠামোগত সুবিধা।

তাহলে কেন হচ্ছে না?

সবাই স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে মগ্ন। এলাকাবাসী চায় কিন্তু উপরের মহল ইচ্ছুক নয়।

আপনার উদ্যোগ বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো কী?

আটানব্বইয়ে প্রথম শুরু করলে সবাই আমাকে পাগল বলেছিল। এখন বলে কথাটা সুন্দর, বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে কাজ শুরু করো। আমার মতে, এটা বাংলাদেশের সমস্যা, বিশ্বব্যাংকের নয়। এগোতে হবে বাংলাদেশকেই। যেভাবেই পারি দেশের মানুষকে আমি এ ব্যাপারে জানিয়ে যেতে চাই। এ চেষ্টাই করব।

অগ্রগতি কতটুকু হচ্ছে?

শুরুর দিকে বুয়েট কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৩-১৪টি গ্রামে জরিপ করেছি। ২০১৪ সালে দেশের ১০টি জেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সভা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি, প্রতিটি গ্রামের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মানুষ এ প্রকল্পে আগ্রহী। যারা আগ্রহী নন, তারা নিজ আবাসস্থলে থাকতে পারেন। তাদের নিয়ে চিন্তা নেই। তারা আসতে না চাইলে আমি অন্যান্য অঞ্চল থেকে মানুষ আনব। ধরুন, শরণখোলায় ইকো ট্যুরিজমের ব্যবস্থা করা হলো। কারণ এটি সুন্দরবনের কাছাকাছি। বিদেশী পর্যটকরা এমন জায়গা চায় ভ্রমণের জন্য। পাশাপাশি এ অঞ্চলে ফসল খুব ভালো হয়। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করলে তিন বছরের মধ্যে এর মাধ্যমেই গোটা অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভব। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত

অংশগ্রহণই জানিয়ে দিচ্ছে, এ কাজের অগ্রগতি কতটা জরুরি!

সম্প্রতি এক এলাকার জনগণের সঙ্গে কথা বলার পর তারা খুব উত্সাহ দেখাল। আমাদের জিজ্ঞাসা করছে, এখনই কীভাবে এর বাস্তবায়ন করা সম্ভব? কিন্তু এটি বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। অনেকে ৫ টাকা দিয়ে ফরম পূরণ করে সদস্য হওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। মাঝে মধ্যে মনে হয়, মানুষের এ সাপোর্টকে আবার কেউ রাজনৈতিক কোনো আন্দোলন বলে মনে না করে। আমরা রাজনীতি করতে আসিনি, শুধু মানুষের ডাল-ভাতের কথা বলছি।

আমি বুয়েটের আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল বিভাগের সঙ্গে কাজ করছি। তারা আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে বলে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তারা ময়মনসিংহের সাতটি গ্রামে জরিপ করে দেখেছে, প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ এ প্রকল্পে রাজি। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কিংবা সংখ্যালঘু। তারা বলেছে, একসঙ্গে যেতে পারলে আমরা যাব। কম্প্যাক্ট টাউনশিপ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে মানুষ শহরে ধাবিত হবে না। গ্রামাঞ্চলে এটি স্থাপন করা হলে বড় বড় শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমতে থাকবে। মানুষ শহরের বস্তিতে থাকতে পছন্দ করছে না। বাধ্য হয়ে মানুষ শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

আগের অ্যাপ্রোচে কি ভুল ছিল?

প্রথমত. এখানে ভিশন বা দর্শন অনুপস্থিত। বাংলাদেশের ভবিষ্যত্ অর্থনীতি কিসের ওপর গড়ে উঠবে? যদি আমরা সরকারি ব্যয়ের বিশাল স্কিম দেখি, সেখানে অধিকাংশ প্রকল্পই পানিসম্পদ-সংক্রান্ত। বহু রিপোর্ট পড়ে এবং অনেক এক্সপার্টের সঙ্গে আলোচনা করে আমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে যে, প্রায় ৫০ বছর ধরে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য বিষয়গুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ভালো কোনো কিছু লক্ষ্য হিসেবে সামনে এলেও তা নেতিবাচকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে, অর্থাত্ পানিসম্পদ-বিষয়ক প্রকল্পের জন্য। খারাপ-ভালো যা-ই হোক, আমাদের অবশ্যই পরবর্তী ২০ বছরে বা ৫০ বছরে বাংলাদেশে কী হতে পারে, তা চিত্রায়ণ করতে হবে।

কীভাবে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে?

এক্ষেত্রে প্রথমত আসে ফিজিক্যাল স্পেসের প্রশ্ন। একটি কম্প্যাক্ট টাউনশিপে কমবেশি ২০ হাজার মানুষকে আশ্রয় দেবে। এভাবে ছয় হাজার টাউনশিপ তৈরি করা যায়। একটি খসড়ায় দেখা যায়, ২০৫০ সালের মধ্যে দেশে সাড়ে চার হাজার কম্প্যাক্ট টাউনশিপ নির্মাণ করা সম্ভব। খাদ্য ও বাসস্থানের অনিশ্চয়তা থাকলে মানুষের আশা ও পরিকল্পনার সময় থাকে না। এটি তার ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি মানুষের আশার জায়গা হয়, এ সুবিধাগুলো প্রদানের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ উপায় কী হতে পারে? আমরা বরং এজন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলি এবং করণীয় সম্পর্কে তাদের কথা শুনি। মানুষ যদি তাদের সমস্যা বুঝতে পারে, তাহলে তারা উপযুক্ত সমাধানটিই গ্রহণ করবে।

মানুষ যদি কম্প্যাক্ট টাউনশিপের আইডিয়া গ্রহণ করে, আমার অনুমান জনসংখ্যার অবস্থা দাঁড়াবে—

ক. ৩৫ শতাংশ আসবে গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন।

খ. ৪৫ শতাংশ আসবে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত থেকে।

অন্যদের মতো আমি মনে করি না যে, মানুষ তার বসতবাড়ির প্রতি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাহলে ঢাকায় কেন এত নতুন মুখের আনাগোনা? গ্রামের জীবন সুখময় নেই— এটি দূরের ভাবনা। তরুণ এবং উদ্যমীদের জন্য একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজমান। সিটিতে নতুন ধরনের নাগরিক জীবন তাদের ভেতর আশা জাগাবে।

গ. ১৫ শতাংশ মানুষ শহর থেকে ফিরে আসবে যেহেতু শহর জনবহুল এবং অবসবাসযোগ্য।

ঘ. ৫ শতাংশ মানুষ থাকবে বিভিন্ন ধরনের প্রবাসী। কেউ কেউ জন্মভূমিকে কিছু দেয়ার জন্য আসবেন, কেউ আসবেন শুধু ছেলেবেলার স্মৃতিকাতরতায়। আবার কেউ কেউ আসবেন ছেলেমেয়েকে পশ্চিমাদের থেকে আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা দেখানোর জন্য (কমপক্ষে কয়েক বছরের জন্য)।

সিটি প্রত্যাশিতভাবে শিক্ষা, উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তির মতো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুটগুলোকে যথাযথভাবে পরিচর্যা করতে পারে। ছোট ছোট বসবাসযোগ্য শহরের মধ্যে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রান্তিক বাংলাদেশে কম্প্যাক্ট টাউনশিপ প্রসার লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে (পশ্চিম) জার্মানি হতে পারে উপযুক্ত মডেল।

এক্ষেত্রে করণীয় কী?

এ সমস্যা সমাধানে সাত রকম মডেলের প্রস্তাব করেছি। শুধু কৃষি দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকেও নজর দেয়া জরুরি, যার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। আর শিল্পায়ন শুধু শহরকেন্দ্রিক না করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। নয়তো বৈষম্য বাড়বে। এক্ষেত্রে উদ্যোগটাই জরুরি। আমরা কয়েকজন মিলে ২০১২ সালের ২০ এপ্রিল কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠন তৈরি করে কাজ করে যাচ্ছি। এটি প্রচলিত অর্থে কোনো এনজিও নয়। এটি ব্যক্তি উদ্যোগে সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিবন্ধিত ও নিজেদের অর্থে পরিচালিত একটি গবেষণা ও প্রচারধর্মী প্রতিষ্ঠান। আশা কির, অন রাও আমাদের এ প্রচেষ্টায় অংশ নেব।